নবজাতক- স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত শিক্ষা,সেবা-সংস্কৃতির একটি আঞ্চলিক বহুমুখী প্রয়াস।১৯৪৩ সালে কিশোর দীপেন ঘোষের নেতৃত্বে জন্ম হলো এক আন্দোলনের, রাজনীতি-সংস্কৃতির এক যৌথ মেলবন্ধন।নবজাতকের প্রথম যুগে আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।দ্বিতীয় যুগে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে।তৃতীয় যুগ হলো আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যুগ।তৃতীয় যুগে নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদ সিঁথির বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানে পরিণত।নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দীপেন ঘোষের আকস্মিক প্রয়াণের পরে শুরু হয় নবজাতকের চতুর্থ যুগ।নবজাতকের ক্ষেত্রে দীপেন ঘোষ যে আদর্শ,দর্শন ও প্রাণের বীজ স্থাপন করেছিলেন সেই পথ ধরেই শুরু হলো নবজাতকের অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে চলা।এখন চলছে পঞ্চম যুগ অর্থাৎবিশ্বায়ন পরবর্ত্তী যুগ।

প্রথম যুগ (১৯৪৩-১৯৫৮)

মল্লিকার আত্মপ্রকাশ ও পথযাত্রা

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জোয়ারে উথল।এমন এক পটভূমিকায় এই মহানগরীর উপকণ্ঠে সিঁথি এলাকায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কয়েকটি কিশোর বন্ধু মিলিত হলো।যদিও তারা তখনো বিদ্যালয়ের গন্ডি পার হয় নি তবুও স্থির করল তারাও ওই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। জন্ম নিল নতুন তারকাদের হাতে লেখা পত্রিকা মল্লিকা।সম্পাদনা করলেন তাদের প্রিয় বন্ধু ও নেতা দীপেন ঘোষ। পত্রিকার চিত্রশিল্পী হলেন সুশীল মন্ডল, লিপিকারের ভার নিলেন মোহনলাল দাস।অন্যান্য বন্ধুদের প্রবন্ধ,গল্প ইত্যাদিও পত্রিকাতে স্থান পেল।বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় এমনি করেই শুরু হল অসীম উৎসাহ উদ্দীপনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি ছোট্ট কিশোর গোষ্ঠীর পথযাত্রা।দিন যেতে লাগল, মল্লিকার আরো কয়েকটি সংখ্যাও প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি কিশোর এসে যোগ দিল তাদের সাথে।

মল্লিকার নবজাতকে রূপান্তর

এদিকে বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতিতে অস্থির সংকটময় যুগযন্ত্রণায় কেবলমাত্র মল্লিকার কর্মকান্ডের মধ্যেই তারা স্থির থাকতে পারল না। বন্ধু দীপেন ঘোষ বুঝিয়ে বললেন **‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র প্রতিবাদের স্তরে থেমে থাকলে চলবে না। ঐসব অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের পাশে দরদী অন্তর নিয়ে দাঁড়াতে হবে।দায়িত্ব নিতে হবে।এস আমরা নবজাতক হিসাবেই সমাজের বৃহত্তর কর্মের আঙিনায় প্রবেশ করি। সুতরাং আমাদের পত্রিকার নাম হোক নবজাতক।‘সবাই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল।**মল্লিকা রূপান্তরিত হলো নবজাতকে।

নবজাতকের আরো কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের সাথে ইতিমধ্যে কেটে গেছে প্রায় দুটি বছর। সমাজ বিকাশের আপন নিয়মেই এই ছোট তরুণ দলটির মধ্যে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের সাধনায় লিপ্ত, কেউ আবার পারিবারিক অর্থ সংকটের চাপে হাজিরা দিতে শুরু করেছে কারখানায়,দপ্তরে।সুতরাং সময়ের অভাব হতে লাগল।কিন্তু সমাজসেবার আদর্শ তাদের হারিয়ে যায় নি।

নবজাতকের গোড়াপত্তনের সময় থেকে তিনজন কর্মীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য- শ্রী অনন্ত দত্ত, শ্রী শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী নরেন দাস।অদম্য মনোবল,অপরিমিত উৎসাহ ও শৃঙ্খলাবিদ্যা নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এদের অতন্দ্র প্রহরায় নবজাতক প্রতিশ্রুতিময় হয়ে ওঠে এই সময়েই। নবজাতকের সংগঠক কর্মীদের মানসিক জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। নবজাতকের তরুণ কর্মীদের কাজে আকৃষ্ট হয়ে এলাকার অনেক বয়স্ক মানুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।এঁদের মধ্যে যাঁরা আর্থিক সাহায্য ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন- শ্রী রামকৃষ্ণ দত্ত, কবি শান্তশীল দাস, শ্রী জীতেন চৌধুরী, শ্রীমতি বীণা চৌধুরী, শ্রী শ্যামসুন্দর সরকার, শ্রীযতীন্দ্রনাথ

ঘোষ,ডঃ কল্যাণ গাঙ্গুলী,শ্রীকমল কৃষ্ণ দাস,শ্রীঅমলেন্দু ঘোষাল, শ্রীপাঁচু মন্ডল, শ্রীকালিদাস দাস,চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম বিপ্লবী শ্রীপুর্ণেন্দু সেন, শ্রীনৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়,শ্রীপরেশ বসাক,শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (কাতুদা)।এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবজাতকের সৃষ্টি।

পাঠচক্রের সূচনা ও বিস্তৃতি - নবজাতক বিদ্যাভবন নৈশ বিদ্যালয়ের আত্মপ্রকাশ

১৯৪৫ সালের এক শারদীয় সন্ধ্যায় এলাকার কয়েকটি দুঃস্থ ছাত্র নিয়ে ৭ নং গৌর সুন্দর শেঠ লেনের একটি বাড়ীতে আরম্ভ হলো পঠনপাঠন।আত্মপ্রকাশ করল নবজাতক বিদ্যাভবন নামে নৈশ বিদ্যালয়। মাত্র দুদিনের মধ্যেই নবজাত শিশুটিকে রায়পাড়ায় নবজাতকের অন্যতম সংগঠক ও কর্মী অনন্ত দত্তের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হলো।ছাত্রসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেল।ছাত্রদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হলে নিজেদের জ্ঞানের সীমাও বাড়াতে হয়। তাই চালু হলো পাঠচক্র। দেশ বিদেশের নানা পত্রপত্রিকা, বহু মূল্যবান বই সংগ্রহ করা হতে লাগল। এখন থেকে মূল সংগঠনের নাম হলো নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদ। কাজ হল তিনটি।
১।দুঃস্থ পরিবারের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানো ও তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগানো।
২।বস্তিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের অভাব অভিযোগ দেখা।
৩।পাঠচক্রের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের জন্য উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়া।

অল্প দিনের মধ্যে নবজাতক বিদ্যাভবন নামে নৈশ বিদ্যালয়ে সিঁথি অন্চলের দুঃস্থ পরিবারের ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা আশীর কাছাকাছি হল।সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ক্লাস চলতো।ছাত্রদের সূত্র ধরে তাদের অভিভাবকরা আসতেন, তাঁদের অভাব-অভিযোগ নবজাতকের কর্মীরা সাধ্যমতো প্রতিকারের চেষ্টা করতেন।পাশাপাশি দর্শন, ইতিহাস,সাহিত্য, অর্থনীতি,বিজ্ঞান,দেহবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিয়মিত পড়া ও আলোচনা নিয়ে কর্মীরা একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন।নবজাতকের কর্মসূচীর অনুরাগী হয়ে পড়লেন পল্লীর কয়েকটি ডানপিঠে দুর্দ্ধর্ষ যুবক,তাঁরাও লেখাপড়া ও জনসেবার কাজে এগিয়ে এলেন।
নবজাতক বিদ্যাভবনের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন দুই কৃতী ছাত্র শ্রী অরুণ দাসগুপ্ত ও শ্রী বীরেশ চক্রবর্ত্তী।

বিদ্যাভবন পাঠাগারের সূচনা

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে,পল্লীর প্রবীন নাগরিক শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তাঁর বিশ্বনাথ কলোনীর বাড়ীতে নবজাতক বিদ্যাভবন নৈশ বিদ্যালয়কে আশ্রয় দিলেন। নতুন বাড়ীতে নতুন উদ্যম নিয়ে আবার কাজকর্ম শুরু হলো।এই সময়ে বিদ্যাভবনের দুই ছাত্র শ্রী অমল বসু ও শ্রী সিদ্ধেশ্বর মান্না সংগঠন পরিচালনার আংশিক দায়িত্ব নিলেন। হাতে লেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের সাথে হাতে লেখা একটি সাপ্তাহিক দেওয়াল পত্রিকা লেখা হতো।এই পত্রিকায় সংবাদ বিচিত্রা নামে একটি স্তম্ভে

ব্যাঙ্গ রচনা লিখতেন শ্রী নরেন দাস।সংগঠনের আর একজন অগ্রণী কর্মী শ্রী প্রণব ভট্টাচার্য্য দুটি পত্রিকাই স্বহস্তে লিখতেন।তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরের সাথে যুক্ত হতো শ্রীসুশীল মন্ডলের অপূর্ব চিত্রকার্য্য।বিদ্যাভবনের ছাত্ররা শ্রীনরেন দাসের নেতৃত্বে নিজেদের জন্য একটি পাঠাগার তৈরী করেছিলেন।শ্রীনরেন দাস ছিলেন গ্রন্থাগারিক।
কর্মীরা মনোনিবেশ করলেন সাহিত্য,ইতিহাস,দর্শন বিষয়ে পড়াশুনায়। এগুলো থেকে নির্বাচিত বিষয়ের উপর কর্মীদের রচনা পাঠচক্রের বৈঠকে পড়া হতো। অনেকের রচনা আবার বাইরের কাগজে ছাপাও হতো।

সমবায় পরিকল্পনার আত্মপ্রকাশ

১৯৪৯-৫০ সালে নবজাতকের কর্মীরা নতুন একটি কর্মক্ষেত্রে পদক্ষেপ করলেন। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য সমবায় ভিত্তিতে একটি খেলনা শিল্প গড়ে তুললেন, নাম শিল্পশ্রী। অল্প মুলধন নিয়ে শ্রী রাজেন সামন্তের বাড়িতে এই শিল্প তৈরি হলো। নিয়ম করা হলো পরিচালক বর্গসহ সবাইকে শ্রম দিতে হবে। ক্রমে একাধিক যন্ত্র এল,ছোট কারখানাটি বড় কারখানায় পরিণত হল।সকাল-সন্ধ্যায় শিক্ষিত যুবকরা কাঠের খেলনা তৈরী করতে লাগলেন, আর কয়েকদল যুবক সেই খেলনা বাজারে বিক্রয় করে জীবিকা অর্জন করতে লাগলেন।এই প্রচেষ্টায় নবজাতক বিদ্যাভবনের শিক্ষক শ্রী হরিপদ ভৌমিক ও শ্রী অনাথ ঘোষের উদ্দোগ অভিনন্দন যোগ্য।

নবজাতক পাঠাগারের সূচনা

বিদ্যাভবনের ছাত্র শ্রী অমল বসু ও শ্রী সিদ্ধেশ্বর মান্নার প্রচেষ্টায় বিদ্যাভবন পাঠাগরের বই এবং আরো কিছু বই পুঁথি সংগ্রহ করে নতুনভাবে কিশোরদের জন্য একটি পাঠাগার তৈরী করলেন, নাম দিলেন নবজাতক পাঠাগার।ইতিমধ্যে শ্রী জলি ভট্টাচার্যের বাড়ীতে বিশ্বনাথ কলোনীর মহাজাতি সংঘের যুবকরা সিঁথি সাধারণ পাঠাগার চালু করেছে শুধুমাত্র । এই দুটি পাঠাগার একত্রিত হয়ে ১৯৫৩ সালের এক শুভ লগ্নে নবজাতক পাঠাগার রূপে শ্রী জলি ভট্টাচার্যের বাড়ীতেই আত্মপ্রকাশ করল।মহাজাতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রী জলি ভট্টাচার্য্যের সহযোগিতায় নবজাতক পাঠাগারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন নবজাতকের কর্মী শ্রীঅনন্ত দত্ত,শ্রী অমল বসু ,শ্রী শান্তি সোম,ডাঃ গৌর দত্ত,শ্রী সিদ্ধেশ্বর মান্না , শ্রী অম্বুজ বসু, শ্রী সন্দীপ গুপ্ত ও শ্রী বীরেন চৌধুরী।

প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য কর্মী

সর্ব্বশ্রী ডাঃ সুশীল মন্ডল,ডাঃ মোহনলাল দাস, ডাঃ কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য,ডাঃ গৌর দত্ত, নারায়ন সেন,প্রণব ভট্টাচার্য্য,জলি ভট্টাচার্য্য,শশাংক চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাস, শৈলেন সিমলাই, তারাপদ ধাড়া, হাজরাদাস বসু, শচীন সরকার, শচীন মুখার্জ্জী, দিলীপ মুখার্জ্জী, হরিপদ ভৌমিক, বীরেন সিমলাই, শৈলেশ চৌধুরী, অমল বসু, সিদ্ধেশ্বর মান্না, বিশ্বজীৎ দাস, সন্দীপ গুপ্ত,শিশির মুখার্জ্জী,অমল গুপ্ত, কমল গুপ্ত,শ্রীমতি শেফালী ঘোষ।

দ্বিতীয় যুগ (১৯৫৮-১৯৭৩)

নবজাতকের নবপর্যায় যাত্রা

১৯৫৮ সালের ২রা মার্চ তারিখে স্থানীয় গণসংগঠনগুলির প্রতিনিধি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা আয়োজিত হলো। এই সভায় উপস্থিত সকলে নবজাতক পাঠাগারকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ঐক্যমত হন। ঐ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ই মার্চ ১৯৫৮ তারিখে আর একটি সভা আহ্বান করা হয়।এই সভা থেকেই সৃষ্টি হলো নতুন নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের অমর বীজ। ফলশ্রুতি হিসাবে ১৪টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও ৭জন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়।শ্রী তারকনাথ ঘোষ ও শ্রী প্রিয়নাথ ভাদুড়ী এই সংগঠনী কমিটি-র যথাক্রমে সভাপতি ও সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন।শ্রী শ্যামসুন্দর সরকার কোষাধ্যক্ষ ও শ্রী দীপেন ঘোষ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নবপর্য্যায়ের এই ১৬ই মার্চ ১৯৫৮ তারিখটিকে নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

সংগঠনী কমিটির নানাবিধ কর্ম্মসূচী গ্রহণ

সংগঠনী কমিটি অর্থসংগ্রহ, পুস্তক সংগ্রহ ও সভ্য সংগ্রহ শুরু করলো। বিভিন্ন অঞ্চলে সভা করে, মুদ্রিত আবেদন দিয়ে ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রায় ৩৫০০ ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করে অভিযান পরিচালনা করা হয়। তৎকালীন সংগঠনের উপযোগী একটি সংবিধান প্রস্তুত করা হয় ও পাঠাগারকে সমিতির আইনে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়।

সংগঠনী কমিটির এই সাফল্যের জন্য শ্রম দিয়েছিলেন সর্ব্বশ্রী প্রভাত ঘোষ, বিশ্বজীৎ দাস, সতীরঞ্জন সেন,ব্রজেন মান্না, শৈলেন সিমলাই,সনৎ ঘোষ,সন্দীপ গুপ্ত,তপন বসু, সত্যনারায়ন রায়, বিভূতি ভট্ট াচার্য্য,জলি ভট্টাচার্য্য,পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, অমল বসু, শুভেন্দু মিত্র,অনিল দাস,বিকাশ গাঙ্গুলী,ভূপেন দত্ত, গৌর দত্ত,শেফালী ঘোষ ও মহাশ্বেতা রায়।

১৩ই অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখে সংগঠনী কমিটি মনোনীত নুতন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত নতুন কর্ম্মসমিতি কার্যভার গ্রহণ করে। এই কর্ম্মসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রী শ্যামসুন্দর সরকার।

নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের পত্তন

একটি ছোটো পাঠাগারকে কেন্দ্র করে নির্দ্দিষ্ট আদর্শে ও পরিকল্পনায় শিক্ষা, সেবা ও সংস্কৃতি বিস্তারের উদ্দেশে কয়েকটি বিভাগ চালু হলো।

নবজাতক মহিলা সমিতি

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ তারিখে পাঠাগারের সমস্ত মহিলা সভ্য ও এলাকার শুভার্থিনীদের এক বৃহত্তর সভায় **নবজাতক মহিলা সমিতি** আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। মহিলা সমিতির প্রথম পরিচালিকা নির্বাচিত হন শ্রীমতি শেফালী ঘোষ।

স্থানীয় মহিলারা তাঁদের নিজস্ব সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা এবং বৃত্তি ও সেবামূলক কাজের শিক্ষা গ্রহণ করতেন।লেডি ব্রেবোর্ন নিডল ওয়ার্ক ডিপ্লোমার প্রশিক্ষণ চালু করা হয়।স্থানীয় দুঃস্থ মহিলারা এখানে শিক্ষালাভ করে জীবিকা অর্জন করতেন।এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন শ্রীমতি শুভা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতি ছায়া মুখার্জ্জী

নবজাতক শিশু বিদ্যালয় ও নবজাতক বিদ্যাভবন ফর গার্লস

জনসেবার কাজে নুতন ক্ষেত্র তেরী করবার জন্য পাঠাগার কর্মসমিতি ১২ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ তারিখের সভায় স্থানীয় জনসাধারনের বহু আকাঙ্খিত শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন।কয়েকটি আত্মত্যাগী সমাজকর্মী নবজাতকের প্রথম যুগে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত কতকগুলি শিশু,কিশোর ও তরুণ ছাত্রকে লালন পালন করেছিলেন একটি অবৈতানিক নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে।এই যুবকদের নীরব দেশ সেবার কাজকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার জন্য শিশু বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় নবজাতক শিশু বিদ্যালয় ।১৯৬০ সালের ১৬ই মার্চ দুজন শিক্ষিকা, একজন পরিচারিকা ও আনুমানিক ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে নবজাতক শিশু বিদ্যালয় আরম্ভ হয়।এই পদক্ষেপে বিশেষভাবে সাহায্য করেন শ্রী প্রভাত ঘোষ। পরবর্ত্তী সময়ে শিশু বিদ্যালয়টি সুনাম অর্জন করে ক্রমশঃ প্রাথমিক, জুনিয়ার হাই, সেকেন্ডারী বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৬৯ সাল থেকেই নবজাতক বিদ্যাভবন ফর গার্লস নামে হাইস্কুল বিদ্যালয় হিসাবে সরকারী অনুমোদন লাভ করে।

নবজাতক বিদ্যাভবনের প্রথম শিক্ষিকাদ্বয়- শ্রীমতি নিয়তি গোস্বামী ও শ্রীমতি সরস্বতী বসু

প্রাথমিক বিভাগ এর প্রধান শিক্ষিকা- ১৯৬১-৬২ সালে শ্রীমতি মীরা সেন এবং ১৯৬৩ থেকে শ্রীমতি সরস্বতী বসু

জুনিয়ার হাই বিভাগের প্রধান শিক্ষিকা- ১৯৬৩ থেকে শ্রীমতি মীরা সেন এবং ১৯৬৯ সালে শ্রীমতি গীতা চক্রবর্ত্তী।

ভাড়াবাড়ী থেকে বিদ্যাভবন তার নিজস্ব নতুন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় ১৯৮৫ সালের ১৬ই মার্চ। ইন্জিনিয়ার কল্যাণ দাশগুপ্ত বিদ্যাভবনের নতুন বাড়ীর নকশা তৈরী করেছিলেন।ভবেশ নিয়োগী ও কল্যাণ দাশগুপ্ত, এই দুজনের তত্বাবধানে নবজাতক বিদ্যাভবনের নতুন বাড়ী তৈরী হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুরেশ মৈত্র এলাকার শিক্ষাবিদ হিসাবে বিদ্যাভবনের পরিচালন সমিতির সভাপতি ছিলেন।

নবজাতক কলাভবন

সঙ্গীত ও শিল্প জগতে অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ করার জন্য এবং ভারতের শিল্প সাধনার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার অভিপ্রায় নিয়ে ১৯৬২ সালের ৪ঠা নভেম্বর **নবজাতক কলাভবন** শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হয়। শুরুতেই আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়। কন্ঠ-সংগীত,যন্ত্র সংগীত,নৃত্য,ছোটদের জন্য অঙ্কণ শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও থাকে আবৃত্তি ও অভিনয়।

এই বিভাগের সাথে যুক্ত স্বনামধন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা-খোকন মজুমদার,শীলা দে,অমিতা ব্যানার্জ্জী, সুশীল

নবজাতক আরোগ্যভবন

বহু বাধা অতিক্রম করে ১৯৬২ সালের ১২ই ডিসেম্বর ডঃ শৈলেন মিত্র মহাশয় আনুষ্ঠানিকভাবে **নবজাতক আরোগ্যভবনের** উদ্বোধন করেন।৭ই জানুয়ারী ১৯৬৩ থেকে চিকিৎসা শুরু হয়।

এই বিভাগের সাথের যুক্ত থেকে যে সমস্ত সুপরিচিত ও সুনামী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগীর সেবা করে গেছেন তাঁরা হলেন- ডাঃ নীহার রঞ্জন সরকার, ডাঃ দেবনারায়ণ সুর, ডাঃ তনেন মিত্র, ডাঃ চন্ডী দত্ত, ডাঃ আর এন চ্যাটার্জ্জী,ডাঃ টি কে দাস, ডাঃ আর এন চক্রবর্তী,ডাঃ মোহনলাল দাস, ডাঃ ললিতা মজুমদার।

এই বিভাগের সফলতায় অংশগ্রহনকারী কর্মীরা হলেন-রবীন্দ্রকৃষ্ণ সোম, সমীরণ দাস, সৌমেন পাল,অসীম দাস, স্বর্ণলতা মোদক

নবজাতক সমবায় পণ্যভবন

১৯৬৩ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর নবজাতক সংগঠনের কর্মী ও দরদীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় **নবজাতক সমবায় পণ্যভবনের** প্রতিষ্ঠা হয়।

এই বিভাগটি যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা হলেন-ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়,শান্তি সোম, পরিমল রায়চৌধুরী,প্রশান্ত বিশ্বাস, সুভাষময় ব্যানার্জ্জী,

দ্বিতীয় যুগের উল্লেখযোগ্য কর্মীবন্ধু

সর্ব্বশ্রী নরেন দাস, ,সমর পাল,প্রবোধ সরকার, ব্রজেন মান্না, সত্যনারায়ণ রায়,অমিয় সরকার,রবীন দাসগুপ্ত,শান্তনু বসু,শুভেন্দু বসু,কাজল সেন,মদন মুখার্জ্জী,সুভাস দাস,চন্ডী বসু,অলোক গুপ্ত,,বিজলী দাশগুপ্ত,বীরেন মুখার্জ্জী,সৌরীন সর্বাধিকারী,ডাঃ শিশির গাঙ্গুলী, সুরেশ মৈত্র,দ্বিজেন বসু, মানব বসু, গৌর ঘোষ, শান্তি মৈত্র,কুনাল মিত্র,অলকা চট্টোপাধ্যায়,আনন্দ দত্ত,সুনির্মল দত্তরায়,অরুণ কুমার

ঘোষ,শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী,হিমাংশু ভট্টাচার্য্য,বিমান ঘোষ, অধ্যাপক সুখেন্দু চক্রবর্ত্তী,অধ্যাপক অজিত বসু,অধ্যাপক অম্বুজ বসু,অসীম মিত্র।

তৃতীয় যুগ (১৯৭৩-১৯৮৬)

নবজাতকের তৃতীয় যুগ হলো তরুণ নেতৃত্বের।দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে বহুক্লেশ,বহু উদ্দম এবং বহু আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদ উত্তর কলকাতার একটি অন্যতম গণসংগঠনে পরিণত হয়েছে।

আরো দুটি বিভাগের পত্তন। জনসচেতনতা ও যুব সমাজকে সঠিকপথে গড়ে তোলার জন্য **নবজাতক জনশিক্ষা বিভাগ** চালু হয় ১৯৭৬ সালে। আগামীদিনের যুব সমাজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কথা ভেবে ১৯৭৭ সালের ১৫ই আগস্ট জন্ম নিল **নবজাতক শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়া বিভাগ**।ডাঃ গৌরীশংকর মুখার্জ্জী বিভাগটি উদ্বোধন করেন।যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভাগটি সফলতা অর্জন করে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বপন নাথ, ভাস্বতী নাথ, স্বপন মজুমদার, শ্যামল পাল ও উৎপলকান্তি রায়।

তৃতীয় যুগে উল্লেখযোগ্য কাজ

১। নবজাতক আরোগ্যভবনের চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবিরের অসামান্য সাফল্য।

২।নবজাতক মহিলা সমিতির বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের অনুমোদন লাভ।

৩।বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নবজাতক মহিলা সমিতি পরিচালিত হস্তশিল্প শিক্ষণ কেন্দ্রের ও নবজাতক বিদ্যাভবনের ছাত্রছাত্রীদের হস্তশিল্পের মনোরম প্রদর্শনী।

৪। নবজাতক পাঠাগারে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী বিভাগের উদ্বোধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রন্থজগতের সাথে নবজাতক পাঠাগারের সংযোগসাধন।

৫। বিদ্যাভবনের ছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য এবং প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অসাধারন সাফল্য।

৬। নবজাতক কলাভবনের অল ইন্ডিয়া রেডিও,কলকাতায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার।

৭।নবজাতক কলাভবনের যোগ্যতার স্বীকৃতি হিসাবে রবীন্দ্র ভারতী বিশভবিদ্যলয়ের অনুমোদন লাভ।

৮। নবজাতক সমবায় পণ্যভবনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও বস্ত্রবিভাগের উদ্বোধন।

৯। এলাকার জনগনর অর্থদান ও নবজাতকর তরুণ কর্মীদর ক্যাটারিং-এর কাজ থক সংগৃহীত অর্থ দিয়ে নবজাতক বিদ্যালয় ও সংস্কৃতি পরিষদর জন্য নিজস্ব জমি ও বাড়ী তৈরী।

১০। শ্রীমতি রেণুকা গুপ্ত কতৃক হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন অবস্থিত তাঁর বসতবাড়ীটি নবজাতক- কে দান।

প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের কর্ম্মীদের সাথে আরো যাঁরা জনসেবামূলক বহুমুখী কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা হলেন সর্ব্বশ্রী কালিদাস দাস, শৈলেন্দ্র কুমার রায়, হৃষিকেশ বসু,ক্যাপ্টেন প্রভাস মিত্র, প্রফুল্ল রায়,সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সুরেন ঠাকুর, কিশোরীমোহন বসু,ভূপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত, পশুপতি নাথ দত্ত,সুনীল রায়, ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জ্জী, রাধারমণ রায়চৌধুরী, অরুণ দাসগুপ্ত, হরিপদ ঘোষ,সন্তোষ বণিক,সৌরীন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, নৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য,রাধারমণ দাস, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অমর ব্যানার্জ্জী,বিশু ভট্টাচার্য্য, খগেন্দ্র চন্দ্র সাহা, যামিনী চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,পরিতোষ বণিক,হরিসুখ গুপ্ত, সনৎ ঘোষ,শুভেন্দু ভট্ট,প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস,অধ্যাপক হিরণ কুমার রায়,দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রফুল্ল দাস,রন্জিত দাস ,নিমাই মান্না, স্বপন ভট্টাচার্য্য, সুনীল দাস, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, বনবিহারী দাস, রীতেন বত্ত, ভক্তিপদ দাস, বিশ্বনাথ দাস, শিবানন্দ
আইচ, অরুনোদয় রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়,স্বরূপ ভট্টাচার্য্য, ফণী চক্রবর্ত্তী,শ্রীমতি লীলা চক্রবর্ত্তী,শ্রীমতি বীথি মিত্র,বীরেন মুখার্জ্জী, স্বপন মুখার্জ্জী

চতুর্থ যুগ (১৯৮৭-২০০৮)

১৯৮৬ সালের ২রা ডিসেম্বর ঘটল ইন্দ্রপতন। নবজাতকের প্রাণপুরুষ দীপেন ঘোষ চলে গেলেন চিরতরে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের অকালমৃত্যুতে তৃতীয় যুগের অবসান হলো।বেশ কিছুদিন স্তব্ধ হয়ে গেল এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্ম।এই সময়ে নবজাতক সংগঠনকে আবার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগীতার হাত বাড়ালেন দীপেন ঘোষের স্ত্রী অধ্যাপিকা শেফালী ঘোষ।তিনি নবজাতকের প্রথম যুগ থেকেই সংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।শেফালী ঘোষ কর্মিদের মনে করালেন যে নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের সংবিধানে যেভাবে সমগ্র পরিষদ ও বিভাগীয় কর্মপদ্ধতির নির্দ্দেশ দেওয়া আছে তাতে একটা কথাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা আছে-থামা যাবে না কারণ থামা মানেই মৃত্যু। নবজাতক প্রতি মূহুর্তে জন্মাচ্ছে,বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এগিয়ে চলেছে।

শেফালী ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দীপেন ঘোষের নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নবজাতকের কর্মধারা পুনরায় এগিয়ে চলল।নবজাতক আরোগ্যভবনের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো ১৯৮৭ সালের ৩০ শে আগষ্ট।এই কাজটি প্রতিষ্ঠাতার নবজাতক আরোগ্যভবনকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল তৈরীর স্বপ্ন সার্থকের একটি বিশেষ পদক্ষেপ।নতুন যন্ত্রপাতি কিনে এবং দক্ষ টেকনিশয়ান নিযুক্ত করে ল্যাবরেটরীর কাজের বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হয়।
নবজাতক পাঠাগার ইতিমধ্যে সরকার পোষিত গ্রন্থাগার রূপে কাজ করে চলেছে।নবজাতক বিদ্যাভবন স্বমহিমায় এগিয়ে চলেছে।নিম্নবিত্ত ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশী,তা সত্ত্বেও মাধ্যমিকের ফলাফল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।প্রয়াত রেনুকা গুপ্তের দান করা বাড়ীতে নবজাতক শিশু বিদ্যালয়, মহিলা সমিতি, কলা ভবন, শারীরশিক্ষা বিভাগের কাজ চলছে।নবজাতক মহিলা সমিতির লেডি ব্রেবোর্ন নিডল ওয়ার্ক ডিপ্লোমার প্রশিক্ষণের কাজ নিয়মিত চলছে।সেলাই-এর আধুনিক মেশিন ক্রয় করে নানারকম হস্তশিল্প

শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।কলাভবন পূর্বের মতোই এলাহাবাদ প্রয়াগ ও বঙ্গীয় সংগীত পরিষদের পরীক্ষায় সফলভাবে অংশ গ্রহণ করছে।নবজাতক শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়াবিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বহুবার জাতীয়-রাজ্য-জেলা এবং অঞ্চলে যোগাসন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছে।ইতিমধ্যে নবজাতক সমবায় পণ্যভবন সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে।

পঞ্চম যুগ (২০০৮ পরবর্ত্তী সময়)

২০০০ সালের পর থেকেই বিশ্বায়নের ঢেউ এসে পড়েছে দেশের প্রতিটি প্রান্তে।দেশের সমস্ত মানুষ তার আঘাতে জর্জরিত।বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থার ছায়া এসে পড়ল সিঁথি এলাকাতেও। মূল্যবৃদ্ধিজনিত আঘাত ক্রমশঃ নবজাতকের কাজেও প্রতিফলিত হতে লাগল।বিশ্বায়নের মানসিকতা এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থাতেও প্রভাব ফেলতে লাগল।নবজাতকের অর্ন্তগত রাজ্য সরকার পোষিত নবজাতক পাঠাগার, নবজাতক পণ্যভবন ও নবজাতক বিদ্যাভবন সরকারের নিয়মে যথাযথভাবে চলছে। আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও নবজাতক তাঁর প্রাণপুরুষের নির্দেশিত পথের দিশা মেনেই এগিয়ে চলার চেষ্টায় আজ-ও বদ্ধপরিকর।

মহিলা সমিতি নানারকমের অনুষ্ঠান আয়োজিত করে প্রশংসা লাভ করছে।যে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কলাভবন কাজ শুরু করেছিল, আজ তা ভীষনভাবে পরিবর্তিত।সঙ্গীত,বাদ্য,নৃত্য, অঙ্কন প্রশিক্ষণ ছাড়াও নানা অনুষ্ঠান অব্যহত রেখেছে নবজাতক কলাভবন। স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসা পাবার জন্য এলাকার কিছু মানুষ এখনো আসছেন নবজাতক আরোগ্যভবনে।শিক্ষাজগতে বর্তমান প্রতিযোগীতামূলক সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বাংলা মাধ্যমের বিদ্যলয়গুলিকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে নামতে হয়েছে, নবজাতক শিশু বিদ্যালয়-ও এর ব্যতিক্রম নয়।নবজাতক শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়াবিভাগের মাল্টিজিম চালু হয়েছে।তথাপি সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া ছোটদের যোগ ব্যায়াম প্রশিক্ষণ আবার শুরু করা গেছে।এই বিভাগে বেশ কয়েকজন তরূণ শিক্ষার্থী পরিষদের নানাকাজে উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।ইতিমধ্যে সেরাম অ্যানালিসিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যৌথভাবে নবজাতক আরোগ্যভবনে রোগ নির্নয়মূলক সমস্ত রকম রক্ত পরীক্ষার সাথে ডিজিটাল এক্স-রে, ই।সি।জি ভালভাবে চলছে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে।। অস্থিবিশেষজ্ঞ ও ফিজিওথেরাপি দ্বারা চিকিৎসা পরিষেবা এখনো মোটামুটি সন্তোষজনক। কলকাতার প্রসিদ্ধ শুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এর সহযোগিতায় চক্ষু চিকিৎসা চলছে অতি স্বল্প মূল্যে।

১৯৪৩ থেকে ২০০৮ পরবর্ত্তী সময়ে আরো অসংখ্য মানুষ নবজাতকে এসেছেন, তাকে পুষ্ট করেছেন।নিজেদের অমূল্য সময় দান করে বিকশিত করে তুলেছেন সমস্ত বিভাগগুলিসহ নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদকে।এই বিশাল কর্মকান্ডে নিয়োজিত শত শত সেচ্ছাসেবী কর্মী কেউ দীর্ঘ দিন,কেউ সীমিত কাল, কেউ সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে কাজ করে চলেছেন।গত কয়েক দশকে তাঁদের মধ্যে কেউ চিরদিনের মতো অথবা অন্য কারণে দূরে রয়েছেন, কেউ এখনো কাজ করে চলেছেন, এঁদের সকলের প্রতি নবজাতক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানায় গত দিনগুলিতে প্রতিষ্ঠানের বিরাট কর্মকান্ডে তাঁদের সংযুক্তির জন্য।